বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি অভিযোজন এবং জাতীয় নীতিমালা

১. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি কেন আমাদের গুরুত্ব দেওয়া উচিত

ক. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত এবং আলোচিত বৈশ্বিক ইস্যু

সভ্যতার ক্রমবিকাশ এর শুরু থেকেই বাসযোগ্য স্থানের খোঁজে মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়ে আসছে। এই স্থানান্তরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি সুন্দর পরিবেশ এবং টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানসমূহের যোগান নিশ্চিত করা। যে কারণে ঐতিহাসিকভাবেই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের স্থানান্তরের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট স্থানান্তর এই ধারাবহিকতায় নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে। বৈশ্বিক জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তন এবং এর বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ বিশেষ করে, ধ্বংসাত্নক প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং অপূরণীয় প্রতিক্রিয়ার (irreversible impact) কারণে মানবজাতির মধ্যে ভবিষ্যতে টিকে থাকার বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই আশঙ্কা থেকেই মানুষ নিজের বাস্তুভিটা ও সম্পদ ত্যাগ করে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তবে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া একটি দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমিত না থাকার কারণে বিষয়টি গত এক দশক ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে আসছে। বিগত বালি সম্মেলনে (CoP-13) জলবায়ু জনিত বাস্তুচ্যুত্যিকে আন্তর্জাতিক প্রটোকলের আওতায় আনার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক প্রচারনা এবং বিষয়টি বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করা হয়, যার প্রেক্ষিতে কানকুন সম্মেলনে (CoP-15) জলবায়ু জনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি বৈশ্বিক অভিযোজন কৌশলের অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক আলোচনায় স্থান পায়।

জলাবায়ু **পরিবর্তনজনিত** স্থানান্তরের বিষয়টি চিহ্নিত করতে গিয়ে IPCC'র (Intergovernmental Panel for Climate Change) **প্রথম** মূল্যায়ন প্রতিবেদনে (১৯৯০) বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক যে সকল নেতিবাচক প্রভাব বা ফলাফল সৃষ্টি হবে তার মধ্যে এককভাবে এবং সর্ববৃহৎ প্রভাব হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী নতুন করে জলবায়ু উদ্বাস্তুর সৃষ্টি বা Human Migration। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে বৈশ্বিক উন্নয়নের গতিধারা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হবে। এর ফলে মানুষের অর্থনৈতিক ও জীবন জীবিকার নিরাপত্তা বিঘ্নতি হবে এবং তাদের মৌলিক অধিকার খর্ব হবে (UNDP Report 2007)। বিগত বছরগুলিতে স্থানান্তর বা Human Migration এর উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরম্যান মেয়ার (Norman Myers) বলেছিলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে ২০৫০ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে প্রায় ২০০ মিলিয়ন (২০ কোটি) মানুষের স্থানান্তর ঘটতে পাওে (Myers and Kent 1995; Myers 2001)। পরবর্তীতে, 'Stern Review on Economic of Climate Change -2006' এবং 'Christian Aid Report-2007' এর প্রতিবেদনে এবং অন্যান্য গবেষণায় প্রফেসর নরম্যান মেয়ারের এই অনুমানের উদ্ধৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ ধারণার বিরোধীরা প্রফেসর মেয়ারের এই আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালান (Black, 2001)। এর মধ্যে বেশ কিছু গবেষণায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের স্থানান্তরে বাধ্য হওয়ার আশঙ্কা তুলে ধরা হয়। ২০১০ সালে Nicholls et al., (2010) এর গবেষণা তাত্ত্বিক প্রমানের সঙ্গে প্রফেসর মেয়ারের অনুমান লব্ধ উদ্বাস্তুর সংখ্যাকে সমর্থন করে। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এই শতকের মধ্যে বৈশ্বিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ০.৫ মিটার বৃদ্ধি পেলে প্রায় ৭২ মিলিয়ন (সাত কোটি ২০ লাখ) মানুষ উদ্বাস্তু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর এই বৃদ্ধি ২ মিটার হলে বিশ্বের প্রায় ১৮৭ মিলিয়ন (প্রায় ১৮ কোটি) মানুষ স্থানান্তরে বাধ্য হবেন। আর এই ভয়াবহ ঘটনার বেশিরভাগটাই ঘটবে পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে।

খ. বাংলাদেশে জলবায়ু জনিত বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি ও ভবিষ্যত প্রবণতা

বাংলাদেশের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি দুঃস্বপ্নময় পরিস্থিতির সংকেত বহন করছে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এই ঘনবসতিপূর্ণ ও দারিদ্রপ্রবণ দেশকে স্বল্প অর্থনৈতিক ও সমাজিক সামর্থ্য নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। যার ফলে দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এরই মধ্যে সুপেয় পানির সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্বাস্থ্যগত সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে,কৃষি উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে এবং 'জলবায়ু হট স্পট' হিসেবে চিহ্নিত সর্বাধিক বিপন্ন এলাকাগুলি থেকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ অন্যত্র পাড়ি জমাচ্ছে ।

UNFCCC এর মতে বিশ্বের উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশসমুহ, উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপরাষ্ট্রসমুহ এবং আফ্রিকার সকল দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশ একটি দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করে এমন বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ২০০৪ সালের ইউএনডিপি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে উষ্ণমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের (Tropical cyclone) ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং বন্যার ক্ষেত্রে ৬ষ্ঠ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ, যার কারনে ব্যাপক জীবন ও সম্পদের ক্ষতি এবং মানব-স্থানান্তর ঘটতে পারে। Global Climate Risk Index-2012 এর প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশ এবং এ সকল ঝুঁকির মধে রয়েছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, উপকূলীয় এবং অ-উপকূলীয় এলাকায় দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা এবং খরা, যার কারণে প্রতিবছর এসকল দেশে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটছে।

IOM এর গবেষণা প্রতিবেদনে (Climate Change and Migration in Bangladesh, Assessing the Evidence 2010) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পবির্তনজনিত স্থানান্তর ও অভিবাসন এর কারণ হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে;

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দ্রুত গতিতে সংগঠিত (Sudden onset events) প্রাকৃতিক দুর্যোগসমুহ (যেমন ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস, হঠাৎ বন্যা ও নদী ভাঙন ইত্যাদি) এবং এর ব্যাপকতা ও ক্ষয়ক্ষতি।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ধীর গতিতে সংগঠিত (Slow onset process) পরিবেশগত দুর্যোগসমুহ (যেমন তাপমাত্রা বৃদ্ধি, খরা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি) এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি।
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে বাংলাদেশের বিশাল উপকূলীয় এলাকা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে এবং
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল নেওয়ার জন্য মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও সামাজিক এবং গোষ্ঠীগত দন্দ্ব-সংঘাত, যার ফলে স্থানান্তর এবং অভিবাসন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে উপরোক্ত অনুমিতিসমুহ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিভাবে প্রভাব ফেলছে এবং অভিবাসন বা স্থানান্তর ঘটাচ্ছে।

গ. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বাস্তুচ্যুতিঃ বর্তমান আইনি কাঠামো ও পরিধি

আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষেরা 'উদ্বাস্তু' হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি। ১৯৫১ সালে উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের কনভেনশনের আওতায় উদ্বাস্তুদের একটি সংজ্ঞা দেয়া হলেও, তা ছিল মূলত যুদ্ধের কারণে আশ্রয়হীনদের জন্য। ১৯৬৭ সালে প্রটোকলেও জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের উদ্বাস্তু হিসেবে গণ্য করা হয় নি। যাদের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেই কেবল এই কনভেনশনের নির্দেশনা কার্যকরী। যে কারণে বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য ইউএনএইচসিআর এর পক্ষ থেকে কোন ধরণের ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে স্থানচ্যুত মানুষদের মর্যাদা রক্ষা করা একটি অনিশ্চিত বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে কিছু প্রগতিশীল জাতীয় আইন ও আঞ্চলিক চুক্তি হয়েছে যা পরিবেশগত বিপর্যয় বা দূর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জনগনকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, উদাহরণ স্বরুপ: অষ্ট্রেলিয়ার স্থানান্তর (জলবায়ু উদ্বাস্তু) ২০০৭ সালের সংশোধনী বিল, কাম্পালা সম্মেলনে (২০০৯) গৃহীত ঘোষণা, কানকুন চুক্তি (২০১০) এবং জুন ২০১১ তে উদ্বাস্তু ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর ন্যানসেন সম্মেলনের কথা উল্লেখ করা যায়। এ সব সম্মেলনের ঘোষনায় জলবায়ু বাস্তুচ্যুতদের উদ্বাস্তু হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আহ্বান জানানো হয়।

২. আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতিঃ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সৃষ্ট হঠাৎ ও ধীরগতির প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন বড় নিয়ামক

জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান গতি আমাদের দেশের পরিবেশগত উপাদানসমূহের উপর চাপ তৈরী করছে। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৬০ মিলিয়ন যা ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে এবং বলা হচ্ছে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা কমপক্ষে ২০০ মিলিয়ন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ২২৫ মিলিয়ন বা ২৫কোটিতে গিয়ে দাড়াতে পারে। তাছাড়া বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৫০ মিলিয়ন) লোক দরিদ্রসীমার নিচে বাস করছে। এ সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশের বসবাস হচ্ছে দেশের অপেক্ষকৃত অনুন্নত, প্রতিবেশগতভাবে ভঙ্গুর (Ecologically fragile) এবং দূর্গম এলাকায় বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার দূর্গম চর, নদী ভাঙ্গন ও খরা প্রবণ এলাকাসমূহে।

এ সকল এলাকা একদিকে যেমন দূর্যোগ প্রবণ অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ক্রমবর্ধমান। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অর্থ হচ্ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের দূর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতাকে হ্রাস করে দেওয়া অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে এ সকল বর্ধিত জনগোষ্ঠীকে দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখার জন্য সরকারকে আরও প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যদি এক্ষেত্রে দূর্যোগ মোকাবেলায় সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহন করা সম্ভব না হয় তাহলে এসকল বর্ধিত জনগোষ্ঠী দূর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং জীবন বাচাঁনোর তাগিদে একসময় তারা স্থানান্তরিত হতে পারে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আমাদের দেশে পরিবেশের কিছু উপাদানের (পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা) উপর চাপ তৈরি করছে। অধিক জনসংখ্যার চাপ সামাল দেওয়ার জন্য সরকারকে দ্রুত নগরায়নের প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন হলেও সরকার চাহিদামত তা করতে পারছে না। ফলে শহুরে বস্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য শিল্পায়ন, কৃষি ও সুপেয় পানির চাহিদা বাংলাদেশের ভূমি, বন ও পানির মত মৌলিক উপাদানগুলির উপর চাপ ক্রমাগত হারে বাড়ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব এই চাপকে আরও তীব্রতর করতে ভূমিকা রাখছে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির তিব্র সংকটের পাশাপাশি দেশের উপকূলীয় এবং অন্যান্য এলাকায় অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা সংকটের মুখে পড়ছে এবং এসকল মানুষ জীবিকার তাগিদে শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

গত ৩০ বছরে সংঘটিত বন্যা ও আক্রান্ড় জনগোষ্ঠী	
সাল	আক্রান্ড় জনগোষ্ঠী
১৯৮৮ জুন	৪৫ মিলিয়ন
২০০৪ জুন	৩৬ মিঃ
১৯৮৪ মে	৩০ মিঃ
১৯৮৭ জুলাই	২৯ মিঃ
১৯৯৮ মে	১৫ মিঃ
২০০৭ জুলাই	১৩ মিঃ
সূত্রঃ DMB দূর্যোগ পরিসংখ্যান	

বন্যা বাংলাদেশের জন্য একটি সাধারন ঘটনা হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে বন্যার গতি-প্রকৃতি, ব্যাপকতা এবং ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বাংলাদেশের বিশাল এলাকা বন্যার কারনে এমনিতেই বিপদাপন্ন এবং অনুমান করা হচ্ছে আগামী ২১০০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই বিপদাপন্নতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যাপকতা হবে আরও বেশী (IOM 2010)। IOM এর প্রতিবেদনে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি সরকার বিপদাপন্ন এলাকাসমুহের বন্যা ঝুঁকি হ্রাসে সময়মত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন না করে তাহলে সেসকল এলাকা থেকে নিরাপদ আবাসস্থলের সন্ধানে ব্যাপক মানব-স্থানান্তর হতে পারে।

IOM'র উপরোক্ত সতর্কতার সত্যতা পাওয়া যায় যদি আমরা বিগত কয়েক দশকের ঘটে যাওয়া বন্যার চিত্র এবং এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতার দিকে নজর দেই। বাংলাদেশে বিগত ২৫-৩০ বছরে কমপক্ষে ১০টি ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হয়েছে (DMB)। এসকল ভয়াবহ বন্যার কারণে কি পরিমান জনগোষ্ঠী স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে তার কোন সুনিদৃষ্ট পরিসংখ্যানিক তথ্য না থাকলেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এসকল বন্যা কোটি কোটি মানুষকে আক্রান্ত করেছে, পাশাপাশি জীবনহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। ফলস্বরূপ জীবন বাঁচানো এবং জীবিকার তাগিদে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর একটা অংশ স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়েছে একথা অবশ্যই অনুমান করা যায়। বাংলাদেশে বন্যার কারনে ২০০৯ সালে ৮৪২,০০০ জন (আইলা এবং এর ফলে সৃষ্ট বন্যা ও জলাবদ্ধতা), ২০১০

সালে ২৫০,০০০ জন এবং ২০১১ সালে ৪০০,০০০ জন লোক স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর হয়েছে (IDMC প্রতিবেদন ২০১১)।

ঘূর্ণিঝড়, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা ঘূর্নিঝড়ের কারণেও অতিমাত্রায় বিপদাপন্ন এবং এর কারণেও মানুষের বাস্তুচ্যুতি ও স্থানান্তরের উদাহারন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাবের কারণে বিগত বছরগুলোতে উপকূলীয় এলাকায় বড় বড় ঘূর্নিঝড়ের সংখ্যা এবং এর ব্যাপকতা ও তীব্রতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পরিবেশ বিশেষজ্ঞগন মনে করছেন। উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে অস্বাভাবিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাস ব্যাপক মাত্রায় জীবনহানি এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ঘটাচ্ছে। সরকার যদিও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলা যথেষ্ট সামর্থ তৈরী করতে পেরেছে এবং এর ফলে জীবনহানির সংখ্যাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে (১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড় "মারিয়ান" এর আঘাতে যেখানে ১৩৮,০০০ লোকের প্রানহানি হয়েছিল সেখানে ২০০৭ সালে ঘূর্নিঝড় "সিডর" এর আঘাতে প্রানহানির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৩৮ জন), কিন্তু ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী জীবনযাত্রা পনুরুদ্ধার ও সচল করার ক্ষেত্রে সরকারের সামর্থ্য যথেষ্ঠ দুর্বল। যে কারণে দেখা যায়, ঘূর্ণিঝড় প্রভাব থেকে মানুষজন তাদের জীবন রক্ষায় সমর্থ হলেও পরবর্তীতে জীবনযাত্রা সচল করার তাগিদে হাজার হাজার মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের বাস্তুভিটা ছাড়তে বাধ্য হয়। যাদের অনেকেরই আবার ফিরে আসার কোন সুযোগ থাকে না। কারন এসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই অন্যের জমিতে অথবা সরকারি খাস জমিতে বসবাস করে যেগুলি ঘূর্ণিঝড়ের কারনে সম্পূর্নরূপে বসবাসের অনুপোযোগি হয়ে পড়ে।

ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ২৬টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে যার মধ্যে ছয়টি (১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৭, ২০০৭ এবং ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় সমূহ) ঘূর্ণিঝড়কে ভয়ংকর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ সকল সাইক্লোনসমুহের ফলে একদিকে যেমন প্রচুর জীবনহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পাশাপশি লক্ষ লক্ষ লোক তাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে স্থানান্তরে বাধ্য হয়েছে। এ সংক্রান্ত এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের কারনে উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১৫% এবং সমগ্র দেশে প্রায় ৪% জনগোষ্ঠী তাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল (Vulnerability and Population Displacement, Dulal Ch Roy)। একইভাবে ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর এর কারণে প্রায় ৬৫০,০০০ লোক এবং ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় বিজলী এবং আইলার কারণে প্রায় ২০০,০০০ লোককে তাদরে ঘরবাড়ী ছেড়ে স্থানান্তরিত হতে হয়েছিল (DMB Statistics)।

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি এবং অভিবাসনের একটি প্রধান কারন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে পরিবেশ উদ্বাস্তু সৃষ্টি বা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য ভবিষ্যত হুমকি বা ঝুঁকির মাত্রাটা কি রকম ? IPCC'র প্রতিবেদনে (AR4) বলা হয়েছে যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে অন্যতম। কারণ ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশের অবস্থান ব-দ্বীপ আকৃতির হওয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত চাপ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেক বেশী হবে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৪০-৪৫ মিলিয়ন লোক বাস করে এবং বেশীর ভাগই দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আশঙ্কা করা হচ্ছে ২০৫০ সাল নাগাদ উপকূলীয় এলাকায় ০৮ মিলিয়ন এবং সারা দেশে প্রায় ২০মিলিয়ন লোক জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে উদ্বাস্তু হতে পারে (বিসিসিএসএপি ২০০৯, অনুচ্ছেদ ২৫, ২৭)। সেই বিশ্লেষন থেকে এটা বলা যায় যে, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রতি ৭ জন লোকের মধ্যে ১ জন হবে জলবায়ু উদ্বাস্তু।

জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদনের তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বিগত একশ বছরে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ০.৫ মিটার (বি ইউ পি, ১৯৯৩) এক্ষেত্রে আমরা সবাই একমত যে, গ্রিন হাউজ এফেক্টের জন্য সারা পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে এবং কোন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বেশীরভাগ উপকুলীয় এলাকা ধবংস করে দিতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা খুবই সীমিত। এক্ষেত্রে উপকুলীয় এলাকা ২-৫ মিটারের মধ্যে যা অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থার সংকেত দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ খুলনার দিকে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৫- ১৮ মিলিমিটার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ২০৫০ সাল নাগাদ ৮৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। বাংলাদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে (Economics of Adaptation of CC in Bangladesh, World Bank & DFID) দেখা যায় যে, আগামী ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার (১ মিটার) বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের মোট ভূমির ১৫-১৭ % সাগর গর্ভে তলিয়ে যাবে। ফলে প্রায় ৩০ মিলিয়ন লোক তাদের বাস্তুভিটা, কৃষিজমি হারিয়ে উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ বছরের পর বছর ধরে নদী ভাঙন, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে ভুক্তভোগী। মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য শহরমূখী হয়ে ঢাকা বা নিকটবর্তী কোন শহরে আবার কখনও অন্য দেশে আশ্রয় নেয়। বাস্তুচ্যুত মানুষের উপর যথাযথ তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রধান দূর্যোগ যেমন; বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গত ৪০ বছর ধরে (১৯৭০-২০০৯) ৩৯ মিলিয়ন (প্রায় ৪ কোটি) লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে (আখতার, ২০০৯)।

বাংলাদেশে জলবায়ু পবির্তনের কারনে সম্ভাব্য বাস্তুচ্যুত্যির চিত্র

জলবায়ু - জনিত ঘটনা	ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা	বাস্তুচ্যুতি ঘটনা	পুনঃপৌনিকতা
সমুদ্র ও নদীভাঙ্গন	৫০০০০-২০০০০০	৬০০০০	প্রতিবছর
লবণাক্ততা	১২০০০০	১০-১৫০০০	প্রতিবছর
জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়	৩-৪০০,০০০	১০০০০০-১২০,০০০	প্রতি ৩ বছরে
জলাবদ্ধতা	৩৫০,০০০	৩০,০০০	প্রতিবছর

তথ্যসুত্রঃ আহসান উদ্দিন আহমেদ এবং শারমীন নিলোর্মি

আহমেদ ও নিলউর্মি (২০০৮) বাস্তুচ্যুতের প্রবণতাকে জীবিকা হারানোর দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করে দেখেন যে, বাংলাদেশে পানি সংক্রান্ত দুর্যোগের কারণে অধিকাংশ মানুষ দুর্যোগ পরিস্থিতির মোকাবেলা করছেন। দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে বেশিরভাগ সময়ই এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করে জীবন-জীবিকা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আর এ কারণেই তারা অন্যত্র পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছেন। আহমেদ ও নিলউর্মি (২০০৮) মতে, যে কোন দুর্যোগের পরপরই বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে (বিশেষত) ঢাকাতে বস্তিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বর্তমান প্রবণতা (অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ)

বাংলাদেশের সকল বাস্তুচুত্যির ঘটনা জলবায়ু জনিত কিনা এ বিষয়ে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে, তবে আমাদের দেশে আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বা অভিবাসনের প্রধান কারণসমূহ পর্যালোচনা করলে

দেখা যায় যে, বেশির ভাগ বাস্তুচ্যুতির শিকার হচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীর জনগোষ্ঠী এবং এ সকল জনগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন এবং উপকূলীয় এলাকায় সৃষ্ট বন্যা বা জলাবদ্ধতার কারণে বাসস্থান ও জীবন-জীবিকার সংকটে পড়ে বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে। তবে একথা হয়ত অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যার ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা আরও বেড়েছে এবং আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতির ঘটনা অতীতের চাইতে আরও বেশী মাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেহেতু আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির উপর নিরেট প্রমান সমৃদ্ধ গবেষণা আমাদের কাছে নাই, সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমাদেরকে বিগত দিনের অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণের উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে।

ক. ঘূর্ণিঝড় আইলার প্রভাব এবং বাস্তুচ্যুতির চিত্র

২০০৯ সালের ২৫ মে বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় "আইলা"। আইলার অঘাতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১১টি জেলায় মোট ৪.৮২ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয় এবং ১৯০ জনের প্রানহানি ঘটে (DMB Situation Report 2009)। এছাড়াও আইলার আঘাতে উপকূল রক্ষাকারী ৭১০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ভেঙে পড়ার ফলে খুলনা ও সাতক্ষীরার ৪টি উপজেলার ২২৮টি গ্রাম পুরোপুরি নোনা পানিতে তলিয়ে যায়। প্রায় ৩ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে মহাসড়ক ও বেড়িবাঁধের উপর আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে লক্ষাধিক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে নিকটবর্তী নগরীগুলোয় আশ্রয় গ্রহণ করে।

ঘূর্ণিঝড় আইলার কারনে সৃষ্ট বাস্তুচ্যুতির চিত্র	
মোট বাস্তুচ্যুতি	৪০০,০০০
সাময়িকভাবে বাধ্যতামূলক অভিবাসনকারী	১২৩,০০০
৬-৯ মাসের জন্য অভিবাসনকারী	৪৬৫০০
দীর্ঘমেয়াদি অভিবাসনকারী	১৪৫০০
তথ্যসুত্রঃ Humanity watch and CSRL. July '2010	

এসব দুর্যোগাক্রান্ত মানুষ ঘরবাড়ি, আবাদি জমি, সম্পদ ও জীবিকা হারিয়ে সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে যায়। দুর্গতদের একটি অংশ এমনকি পার্শ্ববর্তী ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অভিবাসনে বাধ্য হয়। বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতদের মধ্যে ঘরবাড়ি ও চাষের জমি হারিয়ে ৫৪ শতাংশ, বসতভিটা হারিয়ে ১৩ শতাংশ, এলাকায় কাজ ও খাবারের সঙ্কটের কারণে ১৭ শতাংশ এবং নারী ও কন্যাশিশুর নিরাপত্তার খাতিরে ৩ শতাংশ মানুষ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

৪. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি : সরকারের বর্তমান নীতিমালা

ক. বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা আমাদের জন্য কেন প্রয়োজন?

এটা বৈশ্বিকভাবে স্বীকৃত যে বাংলাদেশ হচ্ছে দূর্যোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ন দেশ। লাখ লাখ মানুষ প্রতি বছর দুর্যোগের কারনে ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে জীবন-জীবিকার তাগিদে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে অভিবাসিত হতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া একথাও স্বীকার করতে হবে যে, দুর্যোগ পুর্বেও ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে। কিন্তু এসকল দুর্যোগের ব্যাপকতা, পূনঃপৌনিকতা এবং তীব্রতা যেভাবে বেড়েছে তা অবশ্যই দীর্ঘসময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বেড়েছে। উদাহারন স্বরূপ বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত হিসাবে যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে ভবিষ্যতে উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৪০-৪৫ মিলিয়ন লোক বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই বিশাল বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী দেশের ভূমি ও অর্থনীতির উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে এসকল বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা সচল রাখার ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর সামর্থ্যের অভাবে দারিদ্রতা আরও প্রকট আকার ধারন করতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতে সরকারকে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে এ বিষয়ে একটি নীতিমালা খুবই প্রয়োজন বলে পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকগন সবাই মনে করছেন।

২০০৭ সালে UNFCCC'র ত্রয়োদশ সম্মেলনে (CoP-13) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে বিশ্বকে অধিক নিরাপদ করার লক্ষ্যে "বালি রোড ম্যাপ" প্রস্তাব করা হয় এবং এই রোড ম্যাপ বাস্তবায়নে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সেসময় বেশ কিছু জরুরী কার্যক্রম চিহ্নিত করেন। বাংলাদেশ উক্ত রোড-ম্যাপকে সমর্থন জানিয়ে যে অনুসমর্থনপত্র পেশ করে তাতে উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসাবে অভিযোজন কর্মসুচিকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে নির্ধারন করে। বাংলাদেশের জন্য এই অভিযোজন কর্মসুচির একটি অন্যতম প্রধান কৌশল হচ্ছে আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা, যেটি করতে হলে সরকারের জন্য এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী। কারণ অভিযোজন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, বরং এর জন্য আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজন হবে যেখানে এবিষয়ক একটি নীতিমালা উক্ত সহায়তা কৌশলের ভিত্তি হিসাবে কাজ করতে পারে।

তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বাস্তুচ্যুতি বিশেষ করে আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসনের বিষয়টি সমর্থন জানিয়ে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা গৃহীত হয়েছে যেমন "কানকুন অভিযোজন বিষয়ক কর্মকাঠামো (Cancun Adaptation Framework) এবং জাতিসংঘ প্রণীত আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুত্যি বিষয়ক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা সংক্রান্ত গাইডলাইন (UN Internal Displacement Policy Guideline) ইত্যাদি। বাংলাদেশ উক্ত নীতিমালার অনুস্বাক্ষরকারী এবং এ বিষয়ে নিজ দেশে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনে একটি অন্যতম প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী দেশ। সুতরাং অভিবাসন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায় করতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বাক্ষর রাখতে হবে।

খ. আমাদের বর্তমান নীতিমালা কি আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ঠ ?

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি বা অভিবাসন ব্যবস্থাপনার বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিযোজন কৌশলের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিষয় হলেও বাংলাদেশে এ বিষয়ে যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালা রয়েছে তা বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ নয় । সরকারের বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতিমালাসমুহ প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে প্রনয়ন করা হয়েছে এবং এ সকল নীতিমালায় জলবায়ুতাড়িত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টি এবং এর অভিযোজন ব্যবস্থাপনাকে কোনভাবেই address করা হয় নাই।

বাংলাদেশ সরকার অভিযোজন কর্মসুচিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সরকারের বর্তমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন দ্বারা শুধুমাত্র দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে আক্রান্তদের পুনরুদ্ধার, ত্রাণ

ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এই আইনটি যে খুব দুর্বল তা আমাদের কাছে আইলা পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে প্রমানিত হয়েছে। আইলা পরবর্তী তিন বছরেও সেখানকার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত করা সম্ভব হয় নাই, যে কারনে দীর্ঘসময়ের জলবাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে, আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে অন্যত্র স্থানান্তারিত হয়েছে, কিন্তু সরকার এসকল স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর কিছু এখন পর্যন্ত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত কমিয়ে আনার জন্য সরকার বেশ কিছু আইন ও নীতিমালা (পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ও নীতিমালা) তৈরি করেছে, পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকার "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP, 2009)" প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু হতাশার বিষয় হচ্ছে একমাত্র বিসিসিএসএপি-২০০৯ ছাড়া অন্য আইন ও নীতিমালায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয় নিয়ে তেমন কোন ধারনা বা পূর্বাভাস দেওয়া হয় নাই। বিসিসিএসএপি, ২০০৯ এ আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতির বিষয়ে কিছু কর্মসূচী সংযুক্ত করা হলেও এর কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা অথবা কর্মপরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয় নাই।

খ.১ বিসিসিএসএপি ২০০৯ এবং জলবায়ু উদ্বাস্তু বিষয়ক কর্মকৌশল

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা একটি ১০ বছর (২০০৯-২০১৮) মেয়াদি কার্যক্রম বা কর্মসূচী যা দেশের জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি মোকাবিলা করার জন্য দেশের সক্ষমতা (Capacity) ও সহিষ্ণুতা (Resilience) বৃদ্ধির একটি পরিকল্পনা। এটি প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, এই কর্মপরিকল্পনা হবে জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর একটি সমন্বিত অংশ এবং সর্বাধিক বিপন্ন ও দরিদ্র মানুষদের চাহিদা বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের প্রয়োজনগুলো এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় মূল স্রোত ধারায় অন্তর্ভূক্ত হবে। এই কর্মপরিকল্পনার প্রথম পাঁচ বছরের (২০০৯-১৩) কর্মসূচীতে ছয়টি পিলার রয়েছে; ১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনী ও স্বাস্থ্য (Food security & Social protection and health), ২) সমন্বিত দূর্যোগ ঝুকি ব্যবস্থাপনা (Comprehensive Disaster Risk Management), ৩) অবকাঠামোগত (Infrastructure), ৪) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা (Research & knowledge management), ৫) প্রশমন ও স্বল্প কার্বন উন্নয়ন (Mitigation & low Carbon development) এবং ৬) সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধিকরণ (Capacity building and institutional strengthening)।

জলবায়ু উদ্বাস্তু ইস্যুত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের অবস্থানকে তুলে ধরে বিসিসিএসএপি (২০০৯)' এর অনুচ্ছেদ-৯ এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, বাধ্যতামূলক বাস্তুচ্যুতির কারণে 'পরিবেশ উদ্বাস্তু'দের প্রাকৃতিক ব্যক্তি হিসেবে মূল্যায়ন এবং তাদের অবাধ অভিবাসনের অধিকার বিবেচনার দাবি রাখে। এ স্থানান্তর নিরীক্ষা করা দরকার এবং এ জন্য পর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে।

বিসিসিএসএপি'র ২৭-অনুচ্ছেদ এ বলা হয়েছে, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০ মিলিয়নের (২ কোটির) বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে ফলে ভবিষ্যতে লবণাক্ততা, জলোচ্ছ্বাস ও ঘুর্ণিঝড়ের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। যদিও এই হিসেব অনুচ্ছেদ ২৪ এর সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে উলেণ্টখ করা হয়েছিল যে, যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরো উচু হয় এবং উপকূলীয় পোল্ডারগুলি (Polder) শক্তিশালী না হয় অথবা নতুন করে নির্মাণ করা না হয়, তবে ২০৫০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ৮ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে এবং তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৪/ বিসিসিএসএপি,২০০৯)।

কিন্তু এই কৌশলপত্রের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতার একটি হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে আঞ্চলিক পর্যায়ে অভিগমনের বা স্থানান্তরের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। পারসন ও অন্যান্যদের (২০০৭) গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০০০-০১ সালে পৃথিবীতে অভিবাসীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী মানুষ একই ভাষার ব্যবহার আছে এমন দু-দেশের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এছাড়াও দক্ষিণ থেকে দক্ষিণে অভিবাসীদের ৮০ শতাংশই সীমান্ত-সংযুক্ত দেশগুলির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এমনকি যে সব দেশের মধ্যে আয়ের দিক দিয়ে কম পার্থক্য রয়েছে এমন দেশগুলির মধ্যেই অধিকাংশ স্থানান্তর ঘটেছে (রাথা এবং শ,২০০৭)।

খ.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুতদের বিষয়ে করণীয়

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনায় ৪৪ টি কর্মসূচীর (Program) আওতায় মোট ১৪৫ টি কার্যক্রম (Action) গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য একটি কর্মসূচীর (T4, P6) আওতায় মাত্র তিনটি দীর্ঘ মেয়াদি কার্যক্রমের পরিকল্পনা রাখা হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ড় এই তিনটি প্রকল্পের কোনটিই ট্রাষ্টি বোর্ডের অনুমোদন পায় নাই।

এ্যকশন-১ (টি৪/পি৬/এ১) দেশের ভেতরে ও বাইরে গমনকারী উদ্বাস্তুদের মনিটরিং এর একটি পদ্ধতি উন্নয়নের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং এর জন্য তিনটি মন্ত্রণালয়ের উপর দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল। অথচ উদ্বাস্তুদের নিয়ে দশকেরও বেশি সময় ধরে বেশ কিছু এনজিও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কিন্তু এই কার্যক্রমের সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার কথা পরিকল্পনায় স্থান পায়নি। সরকারের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে এনজিওদের পক্ষে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে বিসিসিএসএপি কৌশল পত্রে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য এ্যাকশন/প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ ভাবে সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল।

টেবিল: জলবায়ু উদ্বাস্তু ইস্যুতে বিসিসিএসএপিতে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ

থিম	**টি-৪: গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা** (Research & knowledge management)
কর্মসূচী	পি-৩. সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে অভিযোজনের জন্য প্রস্তুতিমূলক গবেষণা
	পি-৬. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত জনগোষ্ঠী সমূহের দেশের ভেতরে ও বাইরে স্থানান্তর মনিটরিং করা এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন পরিবেশে পূর্নবাসনে সহায়তা প্রদান
থিম	টি-৬. সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ
কর্মসূচী	পি-১. জলবায়ু প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের জন্য অন্যান্য নীতিমালা সংশোধন।

অন্য দুটো কর্মসূচী মূলত গবেষণাকেন্দ্রিক কর্মকান্ডে। টি৪ পি৩ ; সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে অভিযোজনের জন্য প্রাথমিক গবেষণা এবং টি-৬ পি১; জলবায়ু প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের জন্য অন্যান্য নীতিমালাসমূহ সংশোধন। অবশ্য বিসিসিএসএপি-২০০৯ এর আওতায় গৃহীত অন্যান্য কিছু কর্মসূচী ও কার্যক্রমর বিশেষ কোন কমিউনিটির বিপন্নতা কমানোর জন্য ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহারণ স্বরূপ, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিপদাপন্ন মানুষের জন্য কৃষি-প্রতিবেশ অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (টি-১, পি-২ /এ-১); চাষাবাদের জন্য ফসলের রোগব্যাধি, ক্ষতিকর পোকামাকড়, খরা, বন্যা, ঝড় ও

জলোচ্ছ্বাসের আগাম সতর্কীকরণ ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস-ব্যবস্থা প্রচলন (টি-১, পি-২/ এ ৬) এ্যকশন সমূহ এবং কর্মসূচীসমূহের মধ্যে: প্রতিবেশগত নাজুক এলাকাগুলিতে জীবিকায়নের নিরাপত্তা (টি-১, পি-৮) ; আর্থসামাজিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর (নারীসহ) জীবিকায়নের নিরাপত্তা (টি-১, পি-৯), বন্যার পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন; (টি-২ পি-১), ঘুর্ণিঝড় ও আগাম জলোচ্ছ্বাসের সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন (টি-২ পি-২), এবং টি-২ পি-৪ এর আওতায় উপার্জন ও সম্পদের ক্ষতি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিপন্নতা কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারে।

৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি এবং এদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু প্রস্তাবনা

ক. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত বা উদ্বাস্তুদের তথ্য সংগ্রহ এবং এই ইস্যুতে দীর্ঘ মেয়াদে কার্যক্রম পরিচালনার মতো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। বর্তমানে ইউএনএইচসিআর বা জাতিসঙ্ঘের অন্য কোন সংস্থা এই ইস্যুতে মূলধারাকরণ করে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। এ জন্য এই ইস্যুনিয়ে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ এবং অভিযোজন ও অধিপরামর্শ পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরী হয়ে উঠেছে।

খ. বিসিসিএসএপি-২০০৯ এর আওতায় গৃহীত, টি-৪, পি-৬ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত জনগোষ্ঠীসমূহের দেশের ভেতরে ও বাইরে স্থানান্তর মনিটরিং করা এবং তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন পরিবেশে পূর্নবাসনে সহায়তা প্রদান', শীর্ষক কর্মসূচিটিকে দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নে পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা ও আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে তা সংশোধন করে অবিলম্বে শুরু করতে হবে ।

গ. একটি কার্যকর অভিযোজন নীতিমালা প্রণয়ন করা, যার মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুতিদের কার্যকর পুর্নবাসন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন যেখানে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে;

- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতিদের কার্যকর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে খাস জমিসহ সারা দেশে প্রগতিশীল ভূমি ও কৃষি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য শহরকেন্দ্রিক অভিবাসন ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বাস্তুচ্যুতি কিংবা অভিবাসনের কারণ নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা বিশেষ করে অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং কর্মসংস্থানকারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে করে উৎসে বাস্তুচ্যুতি কিংবা অভিবাসন প্রবণতা কমে আসতে পারে।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বিষয়টিকে কার্যকরভাবে বিবেচনা করা এবং এ বিষয়ে যথাযথ কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিশ্চিত করা।

নেটওয়ার্কসমূহ:

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), বাংলাদেশ ইনডেজিনাস পিপল্‌স নেটওয়ার্ক ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বায়োডাইভার্সিটি (বিপনেটসিসিবিড়ি), ক্লাইমেট ফাইনান্স গর্ভনেন্স নেটওয়ার্ক (সিএফজিএন), ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিসিডিএফ), ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড (সিএসআরএল),ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি), নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ বাংলাদেশ (এনসিসিবি)

যোগাযোগ:

রেজাউল করিম চৌধুরী, ইক্যুইটিবিডি, ইমেইল: reza@coastbd.org, মোবাইল:০১৭১১৫২৯৭৯২

মু. জাকির হোসেন খান, সিএফজিএন, ইমেইল: zhkhan@ti-bangladesh.org, মোবাইল:০১৭১৩০৬৫৫৪৬

মিজানুর রহমান বিজয়, এনসিসি'বি, ইমেইল: BijoyRahmanBD@gmail.com, মোবাইল: ০১৭১৮৭০৩৩২৭

সৈয়দ আমিনুল হক, ইক্যুইটিবিডি, ইমেইল: aminul@coastbd.org, মোবাইল:০১৭১৩৩২৮৮১৫

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে: www.equitybd.org এই ঠিকানায়